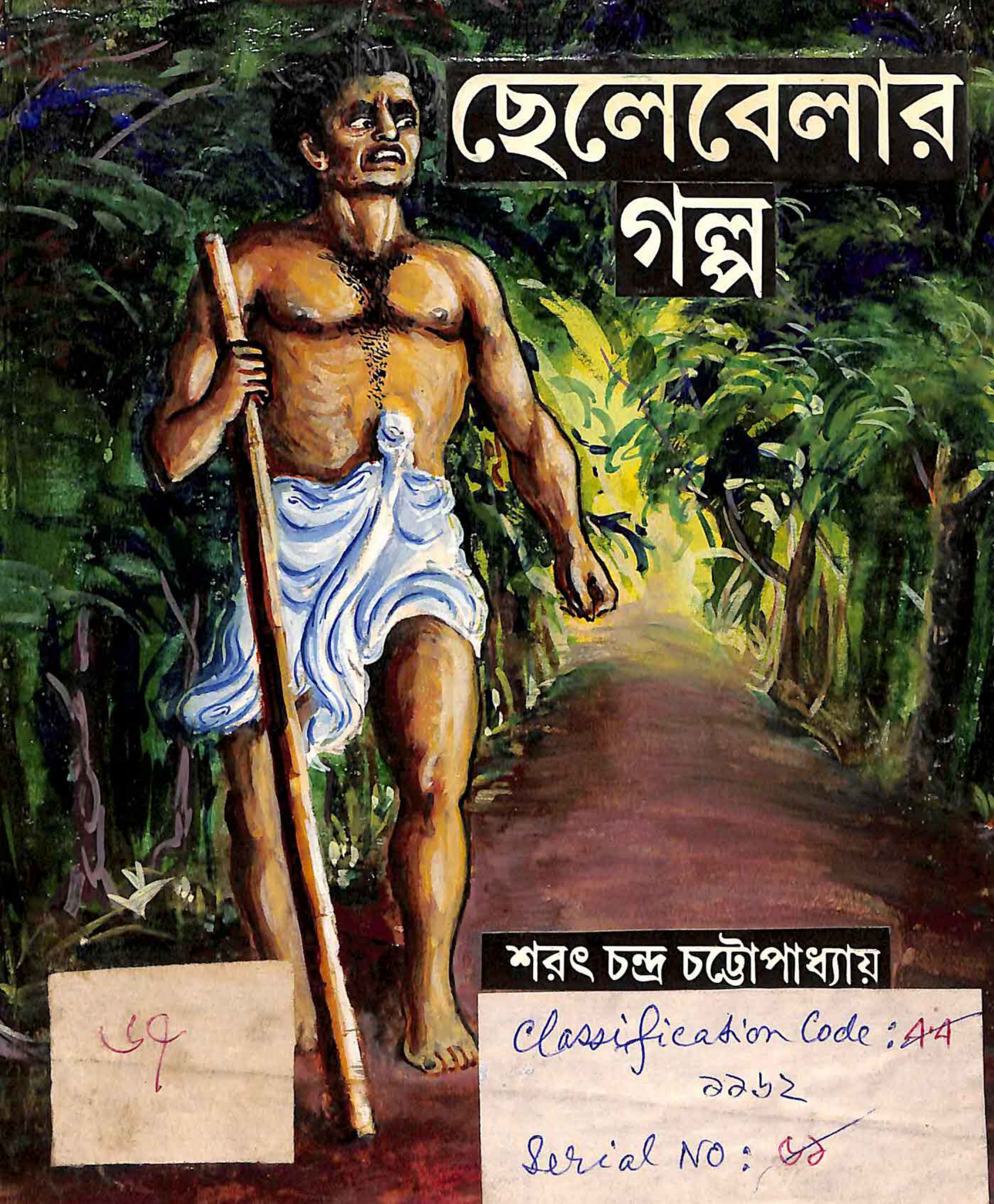


ছেলেবেলার গল্প

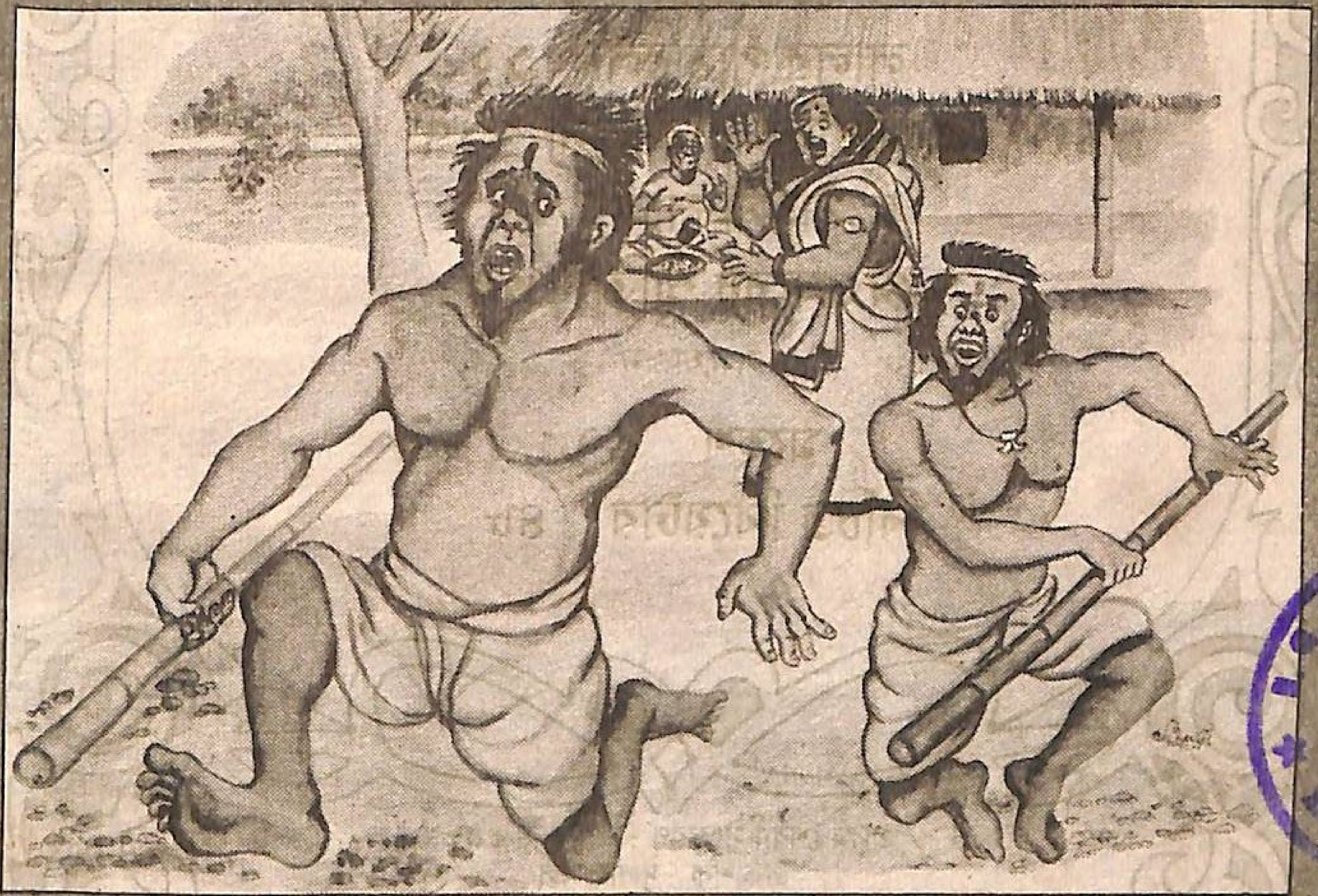
শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।

ছেলেবেলার গল্প

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত



শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ

৮/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

প্রথম শৈব্যা সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৯
প্রকাশক : দুলাল বল
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মূল্য - ১০.০০
মুদ্রাকর : ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-১২

ছেলেবেলার গল্প

ছেলেবেলার গল্প



লালু

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্বে যে, তোমরা ঠিকমত ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলতেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকিল। ইচ্ছে ছিল, ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, যে-বার লালু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটর। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মা'র 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলো পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে তেতলা বাড়ি করেছেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধূলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজী হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেছে। স্মৃতিরত্ন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশী এসেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন। লালুর মা'র আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধূলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পূজো-আহ্নিকের জায়গা হলো, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরি করতে, ফল-ফুল সাজাতে লালুর মা নিঃশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে।—উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল! শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যে ফেটেচে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি-সুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন,



অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপটপ টপটপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ—ছাতটা দেখছি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো-মানুষ ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক ! কি জানি ফাটা ছাত ভেঙ্গে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে ! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।

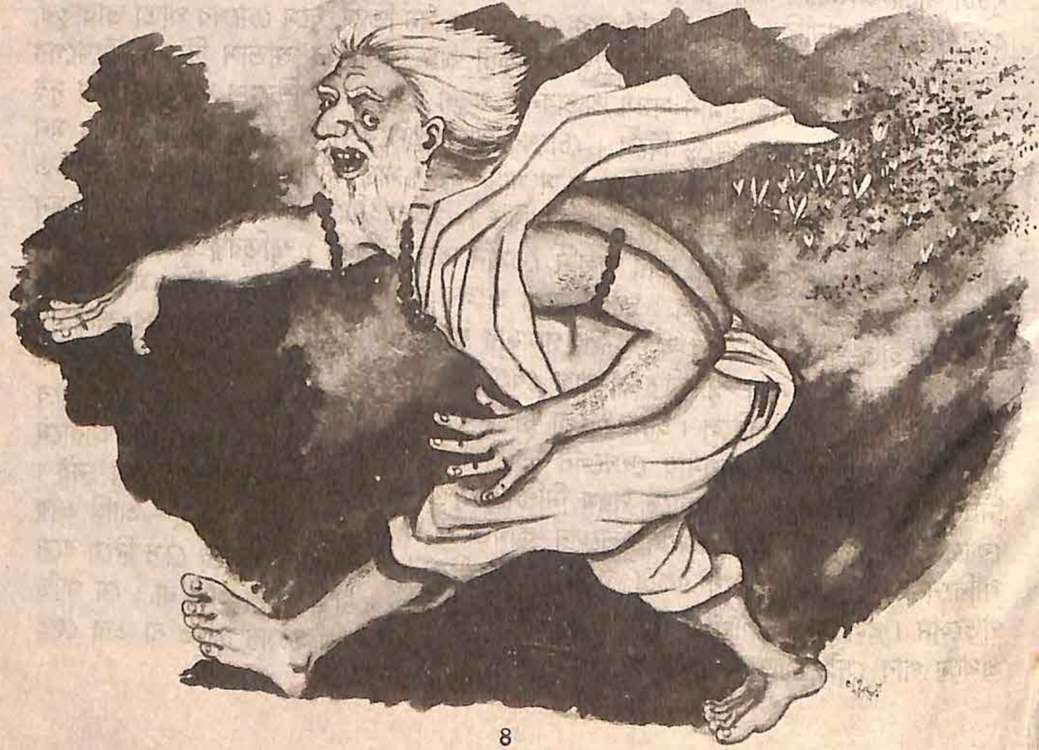
যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়ো হাওয়া দাঁড়াবার জো কি ! কোথায় চাকর-বাকর, কোন্ ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরীব মক্কেল যারা, তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হ'লো ; অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি ! উত্তরে বাতাসে বৃষ্টির ছাঁটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শিরশির করে—কোঁচার খুটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু-ভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না ! হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এসে গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট-দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হ'লো ; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমনি তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হ'লো ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরানী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলে বললেন, কামড়া ব্যাটারা যত পারিস কামড়া,—আমি আর পারিনে।—বলেই বারান্দায় একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু

বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রি সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরানী ভোর না হ'তেই উঠেছেন,—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হ'লো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানলা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোষাকুষি, আসন প্রভৃতি পূজাআহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠেনি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙ্গে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন।



নন্দরানী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এখানে কেন ?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারা রাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা !

কেন বাবা ?

নতুন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারা রাতের বৃষ্টিবাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙ্গে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মত ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে,—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরানীর দু'চোখে অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে ? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয়ত ঐ শয়তান লালুর কোনরকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানে চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মত ছুটে বাহিরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায় ? কাজকর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্।

লালুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন,—কি কাণ্ড করচ ? হলো কি ?

নন্দরানী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কি করলে সে ?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখোসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরানী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বল ?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নেহি হ্যায়। আর একজন এসে জানালে সে মাসিমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসীমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসীমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।



ছেলেধরা

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দুটি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হয়ে গেছে, বাকী শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরী হয়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানির নিযুক্ত ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তাদের কারও পোশাক ভিখিরীর, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ার লাঠিহাতে ডাকাতের মত—এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লীবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রহিল না যে এবার হয়তো তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে।

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছমছম ভাব। আবার তার উপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েচে, কাল কড়েয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর! কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছুল। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে-দম্পতি। ছেলেপুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি-তৈজসপত্র; খুড়ী চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন, বলে

হীরু আমাদের মারতে এসেছিল। হীরু বলে, সেই ভাল—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করবো।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলচি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কিনা বল?

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

নেই?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ী রান্নাঘরে কাজে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে আন্ গে।

হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমাদের বাবাদের ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়তো বেঁচে আছে—তারা এসে চুলচিরে আমার বখ্‌রা ভাগ করে দেবে।

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। এই তোমাদের বলে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ী বললেন, তোর ভারী ক্ষমতা! যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হ'লো রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরীব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মত লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বললে, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বক্‌শিশ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

হীরু বললে, এদেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ—তোমরা মনে করলে পার না কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে ওঁরা জানেন। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারেনি?

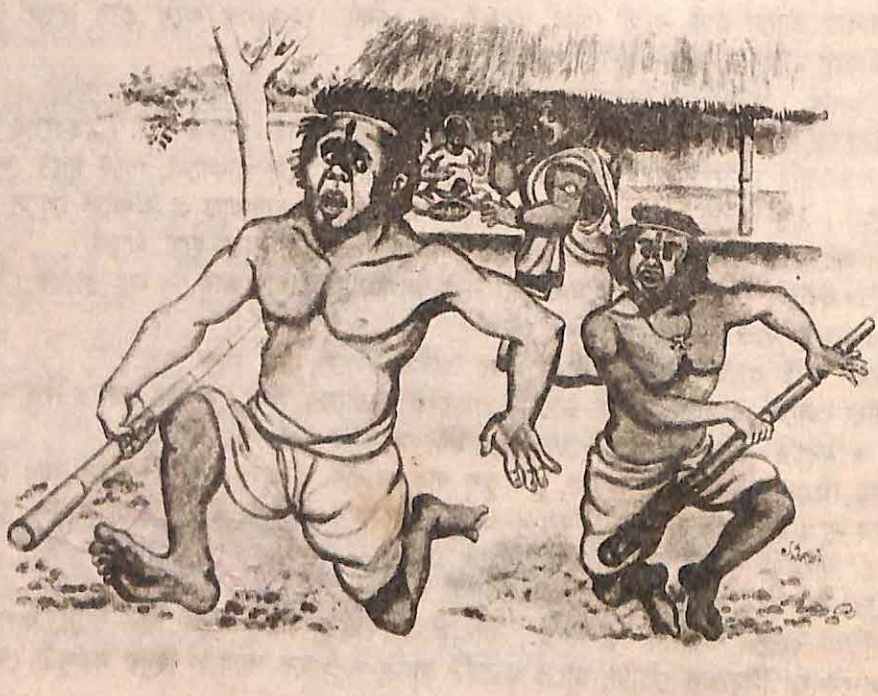
লতিফ বললে, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ্ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাবলে হিঁদুর যমপুরী থেকে

যমদূত এসে হাজির হ'লো। চিনবে কি—কোথায় পালাল তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে, দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ীবেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। ওই পাগড়ি, গাল-পাট্টা, আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে হুমকি একবার ঝাড়বে, তার পর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস্।

লতিফ মিঞা রাজী হ'লো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারা দিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েচেন জগদম্বা। মুখুজ্যেমশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফলমূল ও দুধ। বেতো ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ



আর মামুদ। ইয়া পাগড়ি, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর মাখানো। মুখুজ্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম করে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞ্জে খেলে, আজও খেলছিল,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে, ছুট দিলে—ওগো ছেলেধরা এসেচে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়েছিল—সে চোপা গলায় বললে,—আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক, ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পৌঁছেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি ? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে—চতুর্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল্, ধরে ফ্যাল্ মেরে ফ্যাল্ ব্যাটাদের ! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালাল ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তার পর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার উঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। সে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে ছেলেধরা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন ? ওর পাগড়ি কিসের জন্য ? ওর মুখময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে ? পাগড়ি তার খুলে গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেছে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন, শোনেই বা কে !

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্চে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা—তারা ছেলেধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলেধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগড়িতে সিঁদুরে-রক্তে মাখামাখি—শুধু হাতজোড় করছে আর কাঁপচে।

জিজ্ঞেসা করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে ? কে নালিশ করেছে ? তারা বললে, তা কে জানে ?

ছেলে কৈ ?

তাই বা কে জানে ?

তবে এমন করে মারচো কেন ?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায় ?

তারা বলল, মরা হবে কেন, জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো ?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হ'লো। এতক্ষণে উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি।

বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম—মিএগা, ব্যাপারটা সত্যি কি বল ত ?

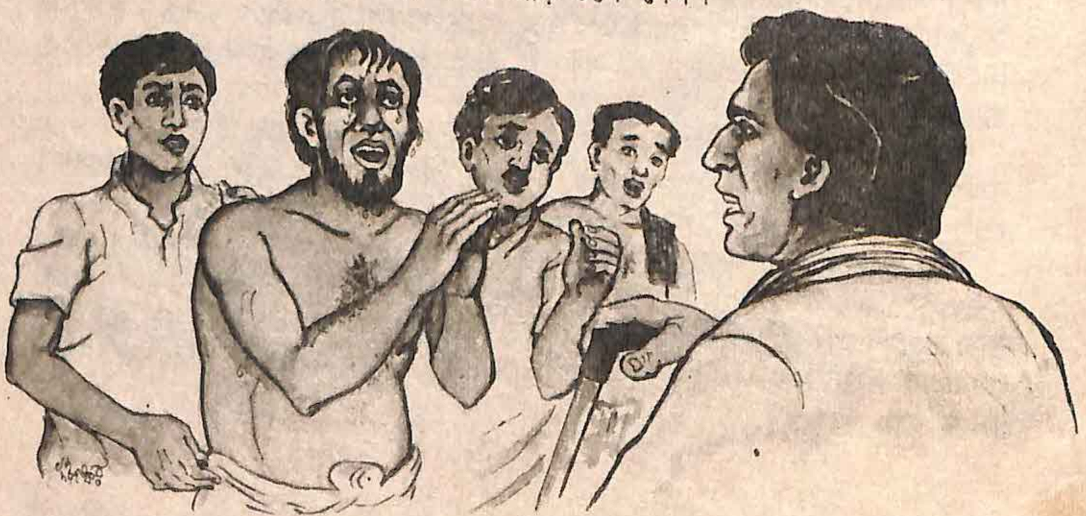
এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে, মুখুজ্যে দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হলো।

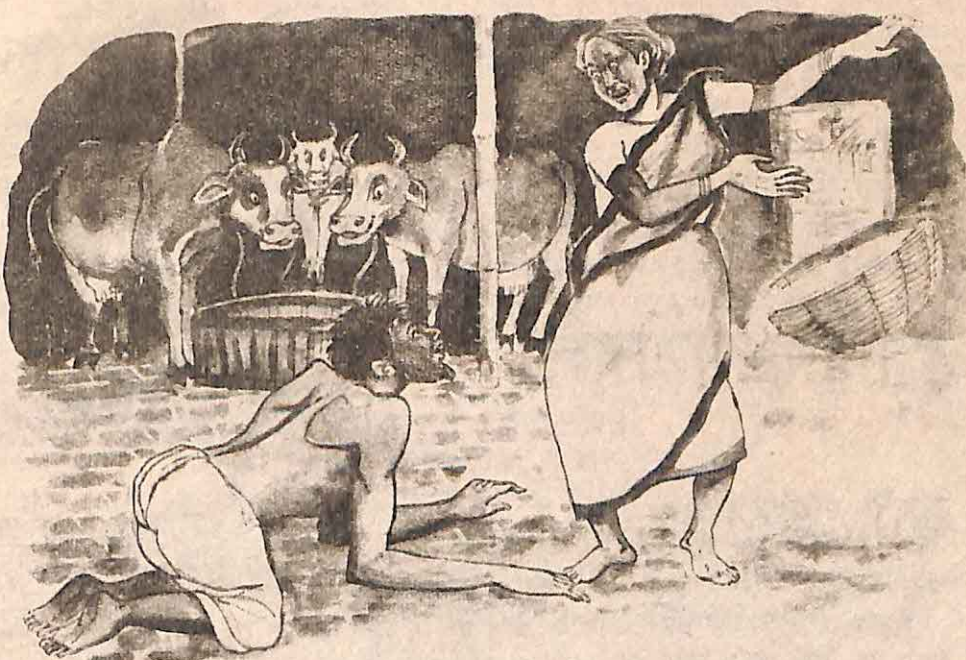
বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এ-সব কাজে এসো না।

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশায়, আর এ-সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায় ?

বললুম, ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচল এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।





অনেক রাত্রে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা-দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো, কে কোথা আছ,—ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত ততই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত-পেরেত নই, আমি মানুষ।

চীৎকারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত—আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভায়ের ভাগ্যে বড় ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রং-টং ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ এক শ' সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।



লালুর পাঁঠাবলী

তার ডাকনাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দীতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলতো,—যা যা দৌড়ো—পারসেন্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কি জানি কোথা থেকে সে এ-সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ সকলের ভাঙ্গা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে ছিড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমন কত কি। কোন কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙ্গিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ

কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমিষে কোথা থেকে আসে! দু'-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপুজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখি সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,—উপায়? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বললে—না।

না কি গো? দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে!

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

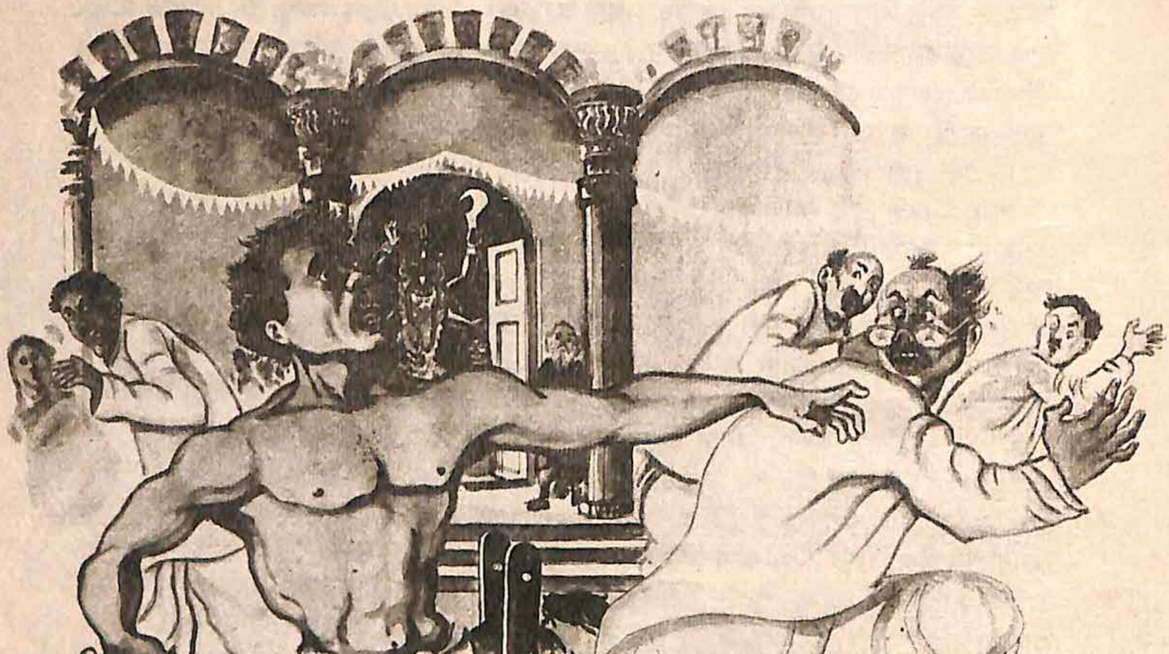
যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই,—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তর ফোয়ারা কালো মাটি রাঙ্গা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশঃ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙ্গা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিতনেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত শব্দসাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ?

বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা ? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা-জয়-কালী ! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে পড়লো, তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরচে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে,



পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কৈ ? পুরুত গেল কোথায় ?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদোকাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু ! বাবা ! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মত।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব ! মায়ের আদেশ !

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্‌খনো নয়—মা যে জগজ্জননী !



লালু বললে—জগজ্জননী ! সে জ্ঞান আছে তোমার ? আর দেবে পাঁঠা-বলি ? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে ? বলো ।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ ।

ঠিক ত ?

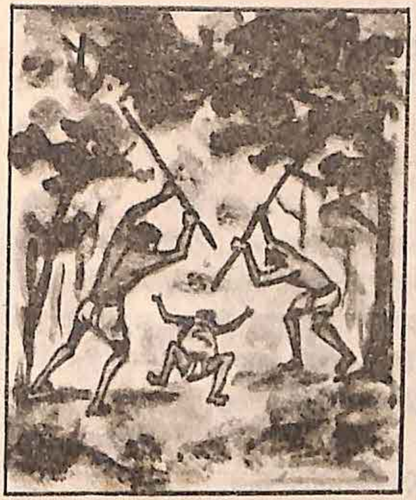
ঠিক বাবা ঠিক । আর কখনো না । আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব ।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম । কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে ? গুরুদেব ? সে কৈ ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো । সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলো না । হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো ।

তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি । লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল । মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো । ঠাকুরের পুজো তখনো বাকী তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হৈ চৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয় ।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি । ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না । দিন-সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে । কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালী-পুজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল ।





একটা দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেছে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাঙলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। তারও আগে, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের যুগে, শুনেছি, লোক-চলাচলের প্রায় কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তরা ছিল যেমন লোভী তেমনি নির্দয়। দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারী ছোট ছোট খেঁটে, তাকে বলতো পাব্‌ড়া। পথিক চলে গেলে তার পা লক্ষ্য করে পিছন থেকে ছুঁড়ে মারতো সেই পাব্‌ড়া। অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো, তখন সকলে ছুটে এসে দুম্‌দাম করে লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবা-চিন্তা বাছবিচার নেই। এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেচি।

ছেলেবেলায় আমার মাছধরার বাতিক ছিল খুব বেশী। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়,—পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ্‌-হাতে নদীতে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরের বেশী জল নেই, সমস্তই শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে যেখানে একটু ফাঁক সেখানেই এই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াত। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরার ছিল আমার বড় আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেছি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। কোনটার মাথা থেকে হয়তো তখনও রক্ত ঝরে জলটা রাঙ্গা হয়ে আছে। নদীর দুই তীরেই ঘন বনজঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নদীর পাঁকে পুঁতে দিত। এর জন্য কখনো দেখিনি পুলিশ আসতে, কখনো দেখিনি গ্রামের কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছে। এ ঝঞ্ঝাট কে করে। তারা চিরদিন শুনে

আসছে পুলিশ ঘাঁটাতে নেই,—তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপজ্জনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়। কাজেই এ দৃশ্য যদি কারও চোখে পড়তো, সে চোখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে অন্যত্র সরে যেত। তারপরে রাত্রি এলে, শিয়ালের দল বেরিয়ে মহা-সমারোহে ভোজনাদি শেষ করে নদীর জলে আঁচিয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে যেত—মড়ার চিহ্নমাত্র থাকত না।

একদিন আমার নিজেরও হয়তো ঐ দশা ঘটত কিন্তু ঘটতে পেলে না। সেই গল্পটা বলি।

আমার বয়স তখন বছর বারো। সকালে ছুটির দিনে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে ঘুড়ি তৈরি করচি, কানে গেল ও-পাড়ার নয়ন বাগদীর গলা। সে আমার ঠাকুমাকে বলচে, গোটা-পাঁচেক টাকা দাওনা দিদিঠাকরুন, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে শোধ দেব।

ঠাকুরমা নয়নচাঁদকে ভালবাসতেন, জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ টাকার কি দরকার হলো নয়ন ?

সে বললে, একটি ভাল গরু আনব, দিদি। বসন্তপুরে পিসীমার বাড়ি, পিসতুত ভাই বলে পাঠিয়েছে, চার-পাঁচটি গরু সে রাখতে পারচে না, আমাকে একটি দেবে। কিছু নেবে না জানি, তবু গোটা-পাঁচেক টাকা সঙ্গে রাখা ভালো।

ঠাকুরমা আর কিছু না বলে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিলেন, সে প্রণাম করে চলে গেল।

আমি শুনেছিলাম বসন্তপুরে ভালো ছিপ পাওয়া যায়, সুতরাং নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিলাম। মাইল-দুই কাঁচা পথ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বসন্তপুরে যেতে হয়। মাইল-খানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে আমি। ভয়ানক রাগ করলে, বললে আমার জন্য সে দশখানা ছিপ কেটে আনবে, তবু কোনমতে আমি ফিরে যেতে রাজী হলাম না। অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু সে শুনলে না। আমাকে ধরে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কান্নাকাটিতে ঠাকুরমা একটু নরম হলেন, কিন্তু নয়নচাঁদ কিছুতে সম্মত হলো না। বললে, দিদি, যেতে-আসতে কোশ-আষ্টেক পথ বৈ নয়, জোছ্না রাত—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পথটা ভালো নয়, ভয় আছে। বেলাবেলি যদি ফিরতে না পারি, তখন একলা গরু সামলাবো, না ছেলে সামলাবো, না নিজেকে সামলাবো—কি করব বল ত, দিদি।

পথে ভয়টা যে কি তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। ঠাকুরমা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন, বললেন, না, কখনো না। যদি পালিয়ে যাস, তোর ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখে পাঠাবো, তিনি পঞ্চাশ ঘা বেত দেবেন।

নিরুপায় হয়ে আমি তখন অন্য ফন্দি আঁটলাম। নয়ন চলে গেলে, পুকুরে নেয়ে আসি বলে তেল মেখে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে ধারে বনজঙ্গল ও আম-কাঁঠাল বাগানের ভিতর দিয়ে মাইল দুই-আড়াই ছুটতে ছুটতে যেখানটায় আমাদের কাঁচা রাস্তা এসে পাকা রাস্তায় মিলেছে সেইখানটায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট-দশেক পরে দেখি নয়ন আসচে। সে আমাকে প্রথমটা খুব বকলে, তারপর আমি কি করে এসেছি শুনে হেসে

ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। এতদুর এসে আর ত ফিরতে পারিনে।

নয়নদা সাতগাঁর একটা দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি বাতাসা কিনে আমার কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিলে, খেতে খেতে প্রায় দুপুরবেলা দু'জনে বসন্তপুরে এসে ওর পিসীর বাড়িতে পৌঁছলাম। পিসীর অবস্থা সচ্ছল। বাড়ির নীচেই কুন্তী নদী ; ছোট, কিন্তু জল আছে, জোয়ার-ভাঁটা খেলে। স্নান করে এলাম, ওদের বড়বৌ কলাপাতায় চিঁড়ে গুড় দুধ কলা দিয়ে ফলারের যোগাড় করে দিলে। খাওয়া হলে নয়নের পিসী বললে, ছেলেমানুষ চার-পাঁচ কোশ পথ হেঁটে এসেছে, আবার যেতে হবে। এখন শুয়ে একটু ঘুমু তার পরে বেলা পড়লে যাবে। তার ছোট ছেলে ছিপ কেটে আনতে গেল।

নয়ন আর আমি দু'জনেই পথ হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিলাম যে আমাদের ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন চারটে বেজে গেছে। বেলার দিকে চেয়ে নয়নদা একটু চিন্তিত হ'লো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় সে প্রণামী বলে পিসীকে টাকা-পাঁচটা দিতে গেল ; কিন্তু তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তোর ছেলেমেয়েদের বাতাসা কিনে দিস।

আমার কাঁধে ছিপের তাড়া, নয়নের বাঁ হাতে গরুর দড়ি, ডান হাতে চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠি। কিন্তু গরু নিয়ে দ্রুত চলা যায় না, কোশ-দুই না যেতেই সন্ধ্যা উতরে আকাশে চাঁদ দেখা দিলে। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় অশত্থ বট আর পাকুড় গাছ ডালে ডালে মাথায় মাথায় ঠেকে এক হয়ে আছে। পথ অন্ধকার, শুধু কেবল পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোছনার ম্লান আলো স্থানে স্থানে পথের উপরে এসে পড়েছে। নয়ন বললে, দাদাভাই, তুমি আমার বাঁ দিকে এসে তোমার বাঁ হাতে গরুর দড়িটা ধরো, আমি থাকি তোমার ডাইনে।

কেন নয়নদা?

না, এমনি। চলো যাই।

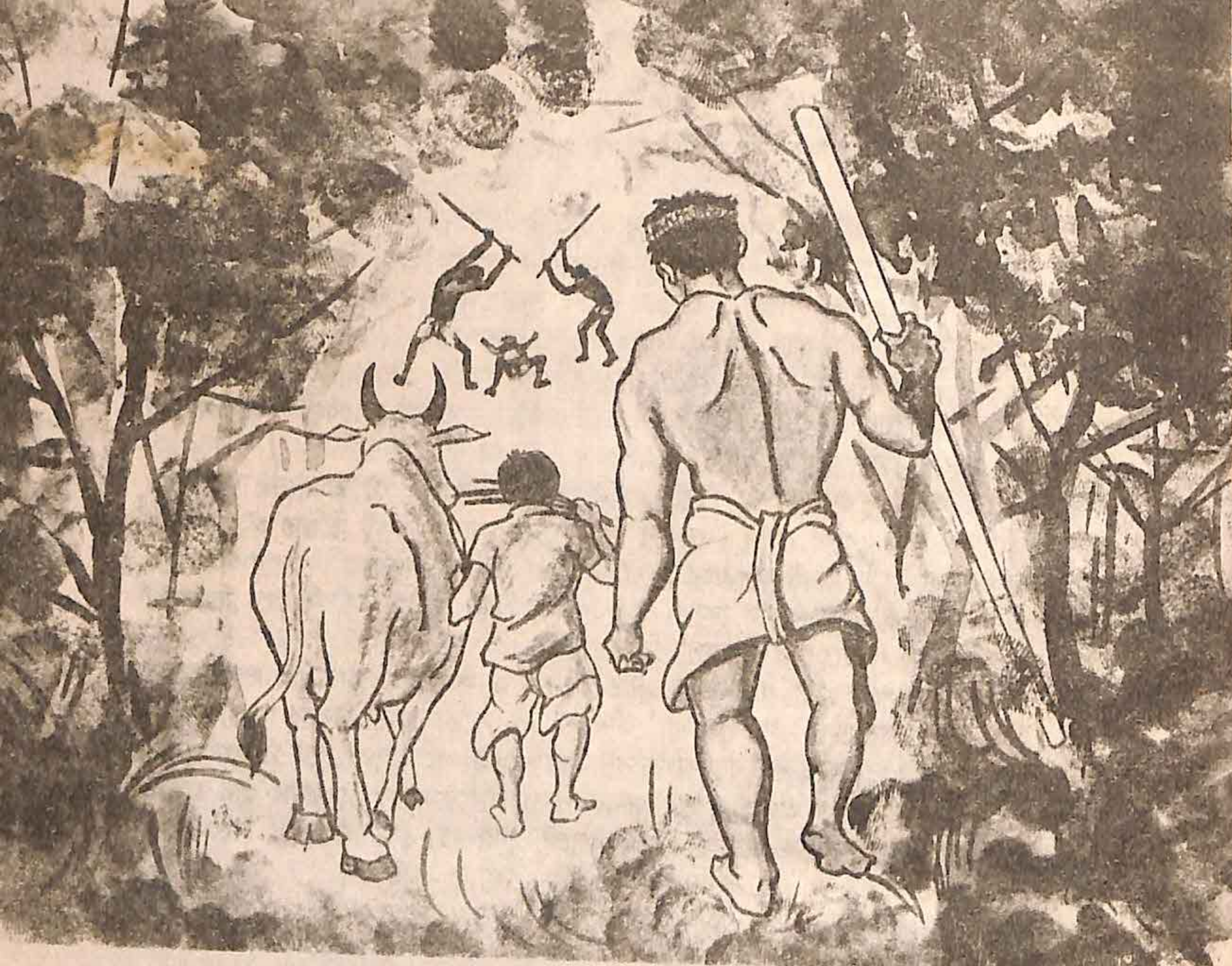
আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ।

ক্রমশঃ পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'পাশের বনজঙ্গল আরও ঘন হয়ে এলো, বহু প্রাচীন সুবৃহৎ পাকুড়গাছের সারি মাথার উপরে পাতায় অবিচ্ছিন্ন আবরণে কোথাও ফাঁক রাখেনি যে একটু চাঁদের আলো পড়ে। সন্ধ্যায় কৃষাণ-বালকেরা এই পথে গরুর পাল বাড়ি নিয়ে গেছে, তাদের খুরের ধুলো এখনও নাকেমুখে ঢুকছে, এমনি সময়ে সুমুখে হাত পঞ্চাশ-ষাট দূরে বিদীর্ণ কণ্ঠের ডাক এলো বাবা গো, মেরে ফেললে গো। কে কোথায় আছো রক্ষে করো। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির ধুপধাপ দুমদাম শব্দ। তার পরে সমস্ত নীরব।

নয়নদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যাঃ—শেষ হয়ে গেল।

কি শেষ হ'লো নয়নদা?

একটা মানুষ। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলে তার পরে বললে, চলো দাদাভাই, আমরা একটু সাবধানে যাই।



গরু বাঁয়ে, নয়নদা ডাইনে, আমি উভয়ের মাঝখানে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচি, দেখেও আসচি মাঝে মাঝে, সুতরাং বালক হলেও বুঝলাম সমস্ত। "কে কোথায় আছো রক্ষে করো!" তখনও দু'কানে বাজচে—ভয়ে ভয়ে বললাম, নয়নদা ওরা যে সব সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা যাবো কি করে? মারে যদি—

না, দাদাভাই, আমি থাকতে মারবে না। ওরা ঠ্যাঙাড়ে কিনা—আমাদের দেখলেই পালাবে। ওরা ভারী ভীতু।

গরু, আমি ও নয়নচাঁদ ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ভয়ে আমার পা কাঁপচে—নিশ্বাস ফেলতে পারিনে এমনি অবস্থা। গাছের ছায়া আর ধুলোর আঁধারে এতক্ষণ দেখা যায়নি কিছুই, পনেরো-বিশ হাত এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো জন পাঁচ-ছয় লোক যেন ছুটে গিয়ে পাকুড় গাছের আড়ালে লুকোলো। নয়নদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দিলে—সে কি ভয়ানক গলা—বললে, খবরদার বলচি তোদের। বামুনের ছেলে সঙ্গে আছে—পাব্‌ড়া ছুঁড়ে মারলে তোদের একটাকেও জ্যান্ত রাখবো না—এই সাবধান করে দিলাম।

কেউ জবাব দিলে না। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে এসে দেখি একটা লোক উপুড় হয়ে রাস্তার ধুলোয় পড়ে। অল্প-স্বল্প চাঁদের আলো তার গায়ে লেগেছে,—নয়নদা ঝুঁকে দেখে হায় হায় করে উঠলো! তার নাক দিয়ে কান দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়চে, শুধু পা দুটো তখনও থরথর করে কাঁপচে! কাঁধের ভিক্ষের ঝুলিটি তখনও কাঁধে, কিন্তু চালগুলি ছড়িয়ে পড়েচে ধুলোয়। হাতের একতারাটি লাঠির ঘায়ে ভেঙ্গেচুরে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

নয়নদা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, ওরে নারকী, নরকের কীট। তোরা মিছিমিছি একজন বৈষ্ণবের প্রাণ নিলি? এ তোরা করেছিস কি! তার ক্ষণেক পূর্বের ভীষণ কণ্ঠ সহসা যেন বেদনায় ভরে গেল।

কিন্তু ওদিক থেকে সাড়া এল না। নয়নের এ দুঃখের প্রধান হেতু সে নিজে পরম বৈষ্ণব। তার গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা, নাকে তিলক, সর্বাঙ্গে নানাবিধ ছাপছোপ। বাড়িতে তার একটি ছোট ঠাকুরঘর আছে, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রীপট প্রতিষ্ঠিত। সহস্রবার ইষ্টনাম জপ না করে সে জলগ্রহণ করে না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় হয়েছিল, এখন নিজের চেষ্টায় বড় অক্ষরে ছাপা বই অনায়াসে পড়তে পারে। প্রদীপের আলোকে ঠাকুরঘরে বসে বটতলার প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে সুর করে পড়ে। মাংস সে খায় না, সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।

তার বৈষ্ণব হবার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে, এখানে সেটুকু বলে রাখি। এখন তার বয়স চল্লিশের কাছে, কিন্তু যখন পঁচিশ-ত্রিশ ছিল, তখন ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে সে একবার বছর-খানেক হাজত-বাস করে। ঠাকুরমার এক পিসতুতো ভাই ছিলেন জেলার বড় উকিল, তাঁকে দিয়ে বহু তদ্বির ও অর্থব্যয় করে ঠাকুরমা ওকে খালাস করেন। হাজত থেকে বেরিয়েই সে সোজা নবদ্বীপ চলে যায় এবং তথায় কোন এক গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, তুলসীর মালা ধারণ করে সে দেশে ফিরে আসে। সেদিন থেকে সে গোঁড়া বৈষ্ণব। নয়ন যখন তখন এসে আমার ঠাকুরমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে যেত। ব্রাহ্মণের বিধবা স্পর্শ করার অধিকার নেই, যে-কোন একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখত, তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে দিলেই, সেই পাতাটি সে মাথায় গলায় বারবার বুলিয়ে বলত, দিদিঠাকরুন আশীর্বাদ করো যেন এবার মরে সৎ জাত হয়ে জন্মাই, যেন হাত দিয়ে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখতে পারি। ঠাকুরমা সস্নেহে হেসে বলতেন, নয়ন, আমার আশীর্বাদে তুই এবার বামুন হয়ে জন্মাবি।

নয়নের চোখ সজল হয়ে উঠত, বলতো, অত আশা করিনে দিদি, পাপের আমার শেষ নেই, সে-কথা আর কেউ না জানুক তুমি জানো। তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি।

ঠাকুরমা বলতেন, সব পাপ তোর ক্ষয় হয়ে গেছে নয়ন। তোর মত ভক্তিমান, ভগবৎ-বিশ্বাসী ক'জন সংসারে আছে! এ-পথ কখনো ছাড়িস নে রে, পরকালের ভাবনা নেই তোর।

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে চলে যেত, ঠাকুরমা হেঁকে বলতেন, কাল দুটি প্রসাদ পেয়ে যাস নয়ন, ভুলিস নে যেন।



এ-সব আমি নিজের চোখে কতবার দেখেছি। সুতরাং যে-বৈষ্ণবের সে প্রাণপণে সেবা করে, তার হত্যায় ও যে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বললে, নিরীহ বোষ্টম ভিক্ষে করে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরছিল, ওর কাছে কি পাবি যে মেরে ফেললি বলতো ? দু'গণ্ডা চার গণ্ডার বেশী ত নয়। ইচ্ছে করে তোদেরও এমনি ঠেঙিয়ে মারি।

এবার গাছের আড়াল থেকে জবাব এলো— দু'গণ্ডা চার গণ্ডাই যা দেয় কে রে ? তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এ-যাত্রা বেঁচে গেলি। ধর্মকথা শোনাতে হবে না— পালা— পালা—

কথা তার শেষ না হতেই নয়ন যেন বাঘের মত গর্জে উঠল— বটে রে হারামজাদা ! পালাবো ? তোদের ভয়ে ? তখন ট্যাঁক থেকে পাঁচটি টাকা বের করে এ-হাতের টাকা ঝনঝন করে ও-হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, —এতগুলো টাকার মায়া ছাড়িস নে বলে দিলাম। পারিস্, সবাই একসঙ্গে এসে নিয়ে যা। কিন্তু ফের সাবধান করে দিই— আমার বাবা ঠাকুরের গায়ে যদি কুটোর আঁচড় লাগে ত তোদের সব ক'টীকে জন্মের মতো রাস্তায় শুইয়ে রেখে তবে ঘরে যাবো। শেত্‌লার নয়ন ছাতি আমি— আর কেউ নয়। বলি, নাম শুনেছিস, না এমনিই লাঠি হাতে ভিখিরী মেরে বেড়াস্ ? হারামজাদা শিয়াল-কুকুরের বাচ্চারা।

গাছের তলা একেবারে স্তব্ধ। মিনিট-দুই স্থির থেকে নয়ন পুনরায় অধিকতর কটু সম্ভাষণে হাঁক দিলে—কি রে—আসবি, না টাকাগুলো ট্যাঁকে নিয়েই ঘরে যাবো ?

কোন জবাব নেই। পথের উপরে দু-তিন গাছা পাব্‌ড়া পড়ে ছিলো, নয়ন একে একে কুড়িয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে বললো,—চলো দাদা, এবার ঘরে যাই। রাত হয়ে এলো, তেমার ঠাকুরমা হয়ত কত ভাবছেন। ওরা সব শিয়াল-কুকুরের ছানা বৈ ত নয়, মানুষের কাছে আসবে কেন ? তুমি একগাছা ছিপ-হাতে তেড়ে গেলেও সবাই ছুটে পালাবে দাদাভাই।

ইতিমধ্যেই আমার ভয় ঘুচে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, বললাম—যাবো তেড়ে নয়নদা ?

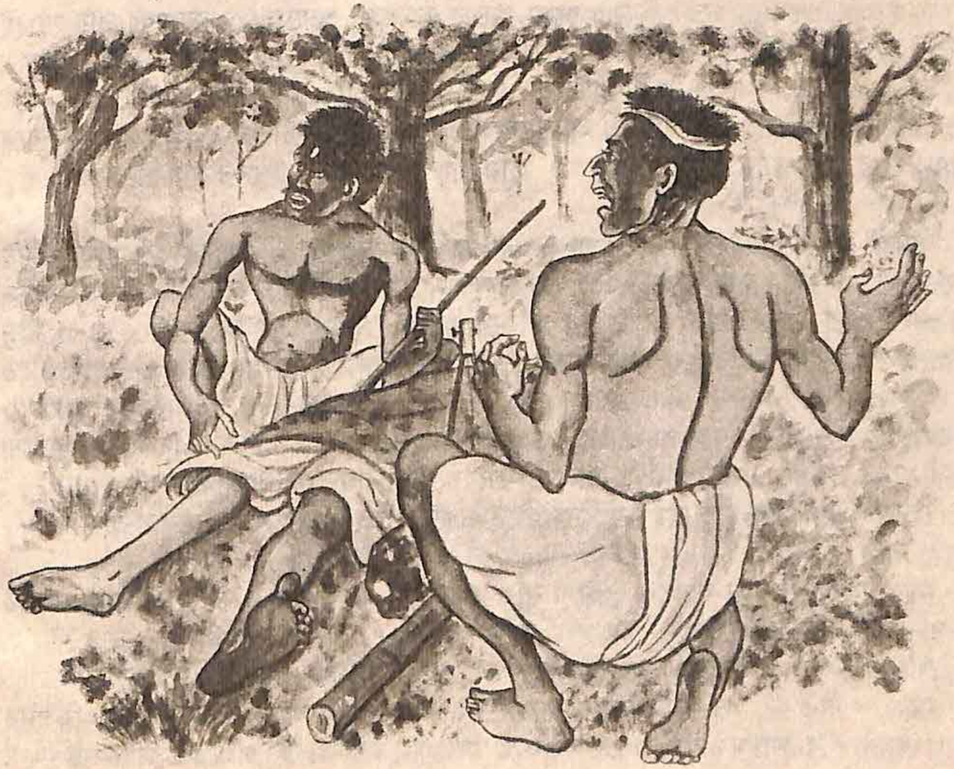
নয়ন হেসে ফেললে। বললে,—থাক্‌গে দাদা, কাজ নেই। কামড়ে দিতে পারে।

আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। নয়নের মুখে কথা নেই, আমার একটা প্রশ্নেরও সে হাঁ-না ছাড়া জবার দেয় না। খানিকটা এগিয়েই একটা বড় গাছতলার অন্ধকার ছায়ায় এসে সে থমকে দাঁড়াল, বলল,—না দাদাভাই, চোখে দেখে ছেড়ে যাওয়া হবে না। বামুন-বোষ্টমের প্রাণ নেওয়ার শোধ আমি দেবো।

কি করে শোধ দেবে নয়নদা ?

এক ব্যাটাকেও কি ধরতে পারবো না ? তখন দু'জনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো।

ঠেঙিয়ে মারার আনন্দে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠলাম। একটা নতুন ধরনের খেলার মত। ওদের সম্বন্ধে কত ভয়ঙ্কর কথাই না শুনেছিলাম ; কিন্তু সব মিছে। নয়নদা যেতে দিলে না, নইলে আমিই তেড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই একটাকে ধরে ফেলতে পারতাম। বললাম,—নয়নদা, তুমি বেশ করে এক ব্যাটাকে ধরে থেকো, আমি একাই ঠেঙিয়ে মারবো। কিন্তু আমার ছিপ যদি ভেঙ্গে যায় ?



নয়ন পুনরায় হেসে বললে,—ছিপের ঘায়ে মরবে না দাদা, এই লাঠিটা নাও, বলে সে সংগৃহীত পাব্‌ড়ার একগাছা আমার হাতে দিয়ে বললে,—গরু নিয়ে এইখানে একটু দাঁড়াও দাদাভাই, আমি এখুনি দু'এক ব্যাটাকে ধরে আনচি। কিন্তু চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে ভয় পেয়ো না যেন।

নাঃ ভয় কি! এই যে হাতে লাঠি রইল।

নয়ন বাকী পাব্‌ড়া দুটো বগলে চেপে ধরলে, তার বড় লাঠিটা রইল ডান হাতে, তার পরে রাস্তা ছেড়ে বনের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলল সেইদিকে। ঠেঙাড়েরা ঠাউরেছিল আমরা চলে গেছি। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে সেই মৃত ভিখিরীর ট্যাক হাতড়ে, ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে।

হঠাৎ একজনের চোখে পড়লো অনতিদূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়ন। সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

—আমি নয়ন ছাতি। অমনি দাঁড়িয়ে থাক্, ছুটে পালাবি কি মরবি।

কিন্তু কথা শেষ না হতেই অনেকগুলো পায়ের ছুটোছুটি শুনতে পেলাম এবং প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই অস্ফুট আর্তস্বরে কেঁদে উঠে কে যেন হুড়মুড় করে একটা ঝোপের উপর পড়ে গেল।

নয়ন চেঁচিয়ে বললে—এক ব্যাটারে পেয়েছি দাদাভাই, আরগুলো পালালো।

শুভ সংবাদে সেইখানে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগলাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ওরে ধরে আনো নয়নদা, আমি ঠেঙিয়ে মারব। তুমি মেরে ফেলো না যেন।

—না দাদা, তুমিই মরো।

আবার একটা করুণ ধ্বনি কানে এলো, বোধ করি নয়নের লাঠির খোঁচার ফল। মিনিট-দুই পরে দেখি একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসচে, তার পিছনে নয়নচাঁদ। কাছে এসে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। এখন তার মূর্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। তখনও কাঁদছিল। তার গালে নয়ন প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে,—চুপ কর্ হারামজাদা। যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি জবাব দে। ক'জন ছিলি? তাদের কি নাম, কোথায় ঘর বল্?

লোকটা প্রথমে বলতে চায় না, কিন্তু পিঠে একটা গুঁতো খেয়ে সঙ্গীদের নাম-ধাম গড়গড় করে বলে গেল।

নয়ন বললে,—মনে থাকবে, ভুলবো না। এখন বল্, বোষ্টমঠাকুর পড়ে গেলে নিজে তুই ক'ঘা বাড়ি দিয়েছিলি?

পাঁচ-সাত ঘা হবে বোধ হয়।

নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, আচ্ছা—পাঁচ-সাত ঘা-ই সই। এবার ঠিক তেমনি করে শো, যেমন করে বোষ্টম ঠাকুরকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। দাদাভাই, এগিয়ে এসো,—ঐ খেঁটে

দিয়ে পাঁচ-সাত ঘায়েই সাবাড় করা চাই কিন্তু। দেখবো কেমন হাতের জোর। তুই ব্যাটা দেরি করচিস্ কেন ? শুয়ে পড়্—বলেই তার কান ধরে টেনে রাস্তায় বসালে। এবং নিজে সে শোবার পূর্বেই প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি পিঠে মেরে পথের ধূলোর পরে লুটিয়ে দিলে। বললে,—দেরি ক'রো না দাদা, মাথা তাক করে মারো। দু-তিন ঘার বেশী লাগবে না।

নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে, চোক-মুখ যেন আর কার। চেহারা দেখে গায়ে কাঁটা দিলে, নতুন খেলা শুরু করবো কি, ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম,—আমি পারবো না, নয়নদা।

পারবে না ? তবে আমিই শেষ করে দিই।

না নয়নদা, না, মেরো না।

কিন্তু, লোকটা লাথি খেয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর নড়েচড়েনি। প্রাণভিক্ষেও চায়নি—একটা কথা পর্যন্ত না।

বললাম,—চলো, ওরে বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে।

শুনে নয়নদা যেন চমকে উঠল। থানায় ? পুলিশের হাতে ?

হাঁ। ও যেমন মানুষ মেরছে, তারাও তেমনি ওকে ফাঁসি দিক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

নয়ন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে তারে একটা লাঠির ঠেলা দিয়ে বললে,—ওরে ওঠ্।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। নয়ন বললে, ব্যাটা মরে গেল নাকি ? যে দুর্বল সিং—দু'দিন হয়ত পেটে একমুঠো অন্নও নেই—আবার পথে এসছে লোক ঠ্যাঙাতে। যা ব্যাটা, দূর হ। উঠে ঘরকে যা।

সে কিন্তু তেমনিই রইল পড়ে। নয়ন তখন হেঁট হয়ে তার নাকে হাত দিয়ে বললে, না মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান হলে আপনিই ঘরে যাবে। চল দাদা, আমরাও ঘরে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে।

পথে যেতে যেতে বললাম, কেন ছেড়ে দিলে নয়নদা, পুলিশকে ধরিয়ে দিলে বেশ হতো।

কেন দাদাভাই ?

বেশ ফাঁসি হয়ে যেত। খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে।

আছে নাকি দাদা ?

আছে বৈ কি। চলো না বাড়ি গিয়ে তোমাকে বই খুলে দেখিয়ে দেব।

নয়ন বিস্ময়ের ভান করে বললে, বলো কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা ?

হাঁ, তাই ত। সেই ত তার উচিত সাজা। আমরা পড়েছি যে !

নয়ন একটুখানি হেসে বললে,—কিন্তু, সব উচিতই যে সংসারে হয় না, দাদাভাই।

কেন হয় না নয়নদা ?

নয়ন হঠাৎ জবাব দিলে না, একটু ভেবে বললে,—বোধ হয় জগতে সবাই ধরিয়ে দিতে

পারে না বলে।

কেন যে পারে না, কেন যে মানুষে এ অন্যায় করে, সে তত্ত্ব সেদিনও জানিনি, আজও না। তবু, এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে খানিকটা পথ চলার পরে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা নয়নদা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার ত মানুষ মারবে ?

নয়ন বললে, না দাদা, আর মারবে না ! আমি বেঁচে থাকতে এ কাজ ওরা আর কখনো করবে না।

জবাবটায় প্রসন্ন হতে পারলাম না। ফাঁসি হওয়াই ছিল আমার মনঃপুত। বললাম,—কিন্তু ওরা বেঁচে ত গেল। শাস্তি ত হ'লো না।

নয়ন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, বললে,—কি জানি,—হবে হয়তো একদিন। পরক্ষণে সচেতন হয়ে বললে,—আমি ত এর উত্তর জানিনে দাদাভাই, তোমার ঠাকুরমা জানেন। তুমি বড় হলে তাঁকে একদিন জিজ্ঞেসা ক'রো।

আমার কিন্তু বড় হবার সবুর সইল না, বাড়িতে পা দিয়েই সমস্ত বিবরণ, শুধু হাত-পা কাঁপার অবান্তর কথাগুলো বাদ দিয়ে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালনে আমাদের ঠ্যাঙাড়ে-বিজয় কহিনী বর্ণনা করে ঠাকুরমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম—গরু কিনতে গিয়ে আজ কি কাণ্ড ঘটেছিল। আগাগোড়া মন দিয়ে শুনে তিনি কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

নয়ন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আমার বলা শেষ হতে টাকা-পাঁচটি ঠাকুরমার পায়ের কাছে রেখে বললে,—গরুটা এমনিই পেলাম। তোমার টাকা তোমার কাছেই ফিরে এল দিদি। না নিলেন পিসীমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইদের দল পথে।

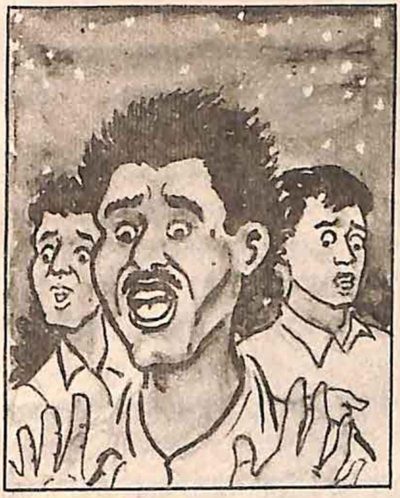
ঠাকুরমা একটু হেসে বললেন দেখা হলে মেজবৌকে জানাব। কিন্তু ও টাকা আমিও নেবো না নয়ন। ও তোর ঠাকুরের ভোগে লাগাগে যা। কিন্তু একটা কথা আজ তোকে বলি নয়ন, এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলি নে।

কেন দিদি ?

তারা কি টাকা বাজিয়ে লোক ভোলায় ? ধর্ যদি লোভ সামলাতে না পেরে ছুটেই আসত ?

তাহলে আরও গোটা পাঁচ-ছয় মরত। তাতে নয়নের পাপের তরায় কতটুকুই বা ভার চাপত, দিদি ?

ঠাকুরমা চুপ করে রইলেন। এ ইঙ্গিতের অর্থ জানেন তিনি, আর জানে নয়ন নিজে। কিন্তু সেও আর কিছু বললে না। দূর থেকে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে টাকা-পাঁচটি মাথায় ঠেকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।



দুঃসাহসী লালু

আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতভম্ব হ'তো। কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হ'তো। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না। গোপালখুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া-পোড়ানো। কারও অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে প্রত্যহ সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘণ্টা-দুই পূর্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন,—ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত?

আজ্ঞে, আছে বৈ কি। আপনি ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব।

বেশ বেশ, এই ত চাই। এর চেয়ে পুণ্যকর্ম সংসারে নেই।

আমাদের দলের মধ্যে ছিল লালুও একজন। ঠিকেদারির কাজে বাইরে না গেলে সে কখনো না বলত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণমুখে খুড়ো এসে বললেন, বিষ্টু পণ্ডিতের পরিবারটা বুঝি রক্ষে পেলে না।

সবাই চমকে উঠলাম। অতি গরীব বিষ্টু ভট্চাযের কাছে বাংলা ইস্কুলে আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। নিজে সে চিররুগ্ন এবং চিরদিন স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। জগতে আপনার বলতে কেউ নেই,—তার মত নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমি দেখিনি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা, দড়ির খাটে বিছানা-সমেত পণ্ডিত-গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম। পণ্ডিতমশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সংসারে কোন-কিছুর সঙ্গে

সে চাহনির তুলনা হয় না এবং সে একবার দেখলে সারা জীবনে ভোলা যায় না।

মৃতদেহ তোলবার সময় পণ্ডিতমশাই আস্তে আস্তে বললেন—আমি সঙ্গে না গেলে মুখাগ্নির কি হবে ?

কেউ কিছু বলবার আগে লালু বলে উঠল, ও-কাজটা আমি করব, পণ্ডিতমশাই। আপনি আমাদের গুরু, সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা। আমরা সবাই জানতাম শ্মশানে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাংলা ইস্কুল মিনিট-পাঁচেকের পথ, হাঁপাতে হাঁপাতে সেটুকু আসতেও তাঁর আধ-ঘণ্টার বেশী সময় লাগতো।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, নিয়ে যাবার সময় ওঁর মাথায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দিবিনে লালু ?

নিশ্চয় দেব, পণ্ডিতমশাই—নিশ্চয় দেব, বলে এক লাফে সে ঘরে ঢুকে কৌটো বার করে আনলে এবং যত সিঁদুর ছিল সমস্তটা মাথায় ঢেলে দিলে।

'হরিবোল' দিয়ে আমরা গৃহ হতে গৃহিণীর মৃতদেহ চিরদিনের মত বার করে নিয়ে এলাম,—পণ্ডিতমশাই খোলা দোরের চৌকাঠে হাত দিয়ে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে-সেখানে শ্রান্তিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লাদ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূর-বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে উত্তরে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠেছে, তার কোন-কোনটা লালুর পায়ের প্রায় নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে-খেয়ে পড়ছে। শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কি জানি সে কতক্ষণে পৌঁছবে। আধ-ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি ; আসার সময়ে আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি, তাদের আসতেই বা না-জানি কত দেরি।

সহসা গঙ্গার ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তরে হাওয়ায় হুহু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপালখুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকচে না রে,—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

কাছে আশ্রয় কোথাও নেই,—একটা বড় গাছ পর্যন্ত না। কতকটা দূরে ঠাকুরবাড়ির আমবাগানে মালীদের ঘর আছে বটে, কিন্তু অতখানি ছোটা ত সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারার সোঁসোঁ শব্দ এলো কানে, ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মত, কি-করি কি-করি—ভাবতে-ভাবতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো। মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘণ্টা-খানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ গেছে কেটে, চাঁদের আলো ফুটেছে দিনের মত। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ি এসে পৌঁছেচে, গাড়োয়ান কাঠ এবং

শবদাহের অন্যান্য উপকরণ নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করচে। কিন্তু ডোমদের দেখা নেই। গোপালখুড়ো বললেন, ও-ব্যাটারা ঐ রকম। শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

মণি বললে, কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন ? সে যে বলছিল মুখে আগুন দেবে। ভয়ে বাড়ি পালালো না ত ?

খুড়ো লালুর উদ্দেশে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন ? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না।

ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো ?

কি হয় ? কত-কি ? শ্মশানভূমি কিনা !

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না ?

ভয় ! আমার ? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েছি জানিস !

এর পরে মণি আর কথা কইতে পারলে না। কারণ সত্যই খুড়োর গর্ব করা সাজে। শ্মশানে গোটা-দুই কোদাল পড়েছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটচেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনচি ; নরু বললে আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দুগুণ হয়েছে, না ?



খুড়ো কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না ? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেছে যে।

কিন্তু তুলো জলে ভিজলে ত চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না ত।

খুড়ো রাগ করে উঠলেন,—তোর ভারী বুদ্ধি। যা করচিস্ কর।

কাঠ বহা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

নরুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে,—খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোঁদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন; তোর মত ভীতু মানুষ আমি কখনো ত দেখিনি নরু ! তুই আসিস কেন এ-সব কাজে ? যা—বাকী কাঠগুলো আন। আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি। গাধা কোথাকার !

আবার মিনিট-দুই গেল। এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো, গতিক ভালো ঠেকছে না। সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠলো।



খুড়ো এবার হাঃ হাঃ—করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে ? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে—তাকে ?

নরু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়চে।

খুড়ো বললেন, হাঁ নড়চে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে—মুখের কথাটা তাঁর শেষ হ'লো না, অকস্মাৎ লেপকাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—নাঁ নাঁ—নঁরুকে নাঁ—গোঁপালকে খাঁবো—

ওরে বাবা রে। আমরা সবাই মারলাম উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। গোপালখুড়োর সুমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা গো, গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললে গো !—রাম—রাম—রাম—

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্মল, ওরে মণি, ওরে নরু, পালাস নে রে—আমি লালু—ফিরে আয়—ফিরে আয়

লালুর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে পৌঁছলো। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপালখুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙ্গায় উঠলেন। লালু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল, কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।

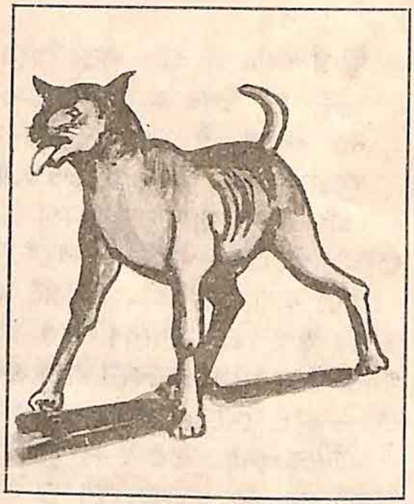
খুড়ো বললেন, বেশ করেছিলে, বাবা, খাসা বুদ্ধি করেছিলে। এখন যাও, ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি—

তিনি কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন। বুঝলেন, এতবড় ভয়শূন্যতা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ-সব সে গ্রাহ্যই করলে না !

মুখে আগুন দেবার কথায় খুড়ো আপত্তি করলেন, না, সে হবে না। ওর মা শুনতে পেলে আর আমার মুখ দেখবেন না।

শবদাহ সমাধা হ'লো। আমরা গঙ্গায় স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সেইমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে।





দেওঘরের স্মৃতি

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। আসার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা বারংবার মনে হয়েছিল—

ওষুধে ডাক্তারে—
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়
—করলে যখন অস্থি জর জর
তখন বললে হাওয়া বদল করো।

বায়ু পরিবর্তনে সাধারণতঃ যা হয় সে-ও লোকে জানে, আবার আসে-ও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙ্গা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙ্গে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসে,—পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি-দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি—পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হ'তো যেন ওদের প্রত্যেকেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসতো। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপটস্ গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেতো। হঠাৎ কি জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,—কেউ ধরলে না ত ? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই,—পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা—কিন্তু তিনি দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হ'লো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য

নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে-চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশী। প্রথমেই যেত পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরিবেরির আসামী। ফোলা-পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েচে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে,—সেটা পথ চলার বিঘ্ন—তবু, কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সব চেয়ে দুঃখ হ'ত আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেতো। সঙ্গে আত্মীয়স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। বয়স বোধকরি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ মুখ তেমনি পাণ্ডুর—কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই! শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সব চেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না—অথচ, রেখে আসবারও ঠাঁই নেই। কি ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি। মনে হ'তো আমাকে দেখে যেন সে লজ্জা পায়। কোন মতে এই স্থানটুকু তাড়াতাড়ি পালাতে পারলেই বাঁচে। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ে সন্তান তিনটিকে ঢেকেঢুকে প্রত্যহই সে এই পথে চলতো। হয়ত ভেবেচে, আর কিছুতে যা হ'লো না, সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় এই অত্যন্ত ক্লেশকর হাঁটার মধ্যে দিয়েই সেটুকু সে পূরণ করে নিতে পারবে। রোগমুক্ত হয়ে আবার ফিরে পাবে বল, ফিরে পাবে আশা—আবার স্বামীপুত্রের সেবায় সংসারে নারী-জীবনটা সার্থক করে তুলতে পারবে। নিজের মনে বসে বসে ভাবতাম, এ ছাড়া আর কি-ই বা কামনা আছে তার? বাঙলা দেশের মেয়ে,—এর বেশী চাইতে কে কবে শেখালে তারে? মনে মনে আশীর্বাদ করতাম—মেয়েটি যেন ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, যে ছেলে তিনটি তার সমস্ত জীবনীশক্তি শোষণ করে নিয়েছে তাদেরই যেন ও মানুষ করবার অবকাশ পায়। সে কার মেয়ে, কার বৌ, কোথায় বাড়ি কিছুই জানি নে,—শুধু এই বাঙলা দেশের অসংখ্য মেয়ের প্রতীক হয়ে সে যেন আমার মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটে রেখে গেল, যা সহজে মুছবার নয়।

আমার সঙ্গে এসেছিল একটি যুবক বন্ধু। নিঃস্বার্থ তার সেবা,—কলকাতায় ভারী অসুখের সময়েও যেমন দেখেচি, এখানেও দেখতে পেলাম তেমনি। মাঝে মাঝে সে বলতো—চলুন দাদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসবেন। আমি বলতাম, তুমি যাও ভাই, আমি এখানে বসেই ও-কাজটা সেরে নিই। সে অসহিষ্ণু হয়ে বলতো—আপনার চেয়েও কত বেশী বয়সের লোকে এখানে বেড়িয়ে বেড়ায়। একটু চলাফেরা না করলে ক্ষিদে হবে কেন? বলতাম, ওটা কম হলেও সইবে, কিন্তু পথে পথে মিছিমিছি ঘুরে বেড়ানো সইবে না।

সে রাগ করে একলাই বেড়াতে যেতো। কিন্তু সাবধান করে দিত,—অন্ধকারে বাড়ি ফিরবেন না যেন। আলো আনতে চাকরদের ডাকবেন। এদিকে 'করেত' সাপটা কিছু বেশী। নিরীহ জীবন, কেবল গায়ে পা দেওয়াটা তারা পছন্দ করে না।

সেদিন বন্ধু গেছেন ভ্রমণে। সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা আহরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবতঃ এঁরা

বাতব্যাধিগ্রস্ত সন্ধ্যার পূর্বেই এঁদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হ'লো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পিছনে চলেছে। বললাম, কি রে, যাবি আমার সঙ্গে ? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি ? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বুঝলাম সে রাজী আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল তা বুঝা যায়। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সুমুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেলে না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হ'ল, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘণ্টা-খানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসেনি—কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন ?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগলো। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,—না খেয়ে যাসনে। বুঝলি ? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে—অর্থ বোধ হয় এই যে—সত্যি বলচ ত ?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নীচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যাননি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন ক'রে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম প্রত্যহ খাবার ত অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তির ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালীর মালিনী—এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার 'পরেই বেশী ; অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হ'লে সে হয় পথের সঙ্গী ; জিজ্ঞাসা করি, হাঁ অতিথি, আজ মাংস-রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে ? হাড়গুলো চিবোতে লাগলো কেমন ? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালীর বউ তারে মেরে-ধরে বার করে দিয়েছে,—বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সুমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।

হঠাৎ শরীর খারাপ হ'লো, দিন-দুই নীচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাজগটা সেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের



রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম, কংগ্রেসের পাণ্ডা যাঁরা—মন্ত্রী হবার তাদের কি উগ্র বাসনা। অথচ নিস্পৃহতার আবরণে সেটা গোপন করার কত-না কৌশল! আইন যারা বানিয়ে দিলে একটা কথাও শুনলে না, ব্যাখ্যা নিয়ে তাদেরই সঙ্গে কি ঝুটোপুটি লড়াই। নিঃসন্দেহে প্রমাণ দিতে চায় ওদের মতলব ভাল নয়। বিড়ম্বনা আর বলে কারে!

সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায়নি তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম—খাওয়া হয়েছে ত রে? কি খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হ'লো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কি একটা ও নালিশ জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালালো।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁ রে কুকুরটারে আজ খেতে দিয়েছিস ?
আজ্ঞে না। মালী-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।
আজ ত অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হ'ল কি ?
মালী-বৌ চেঁচেপুঁচে নিয়ে গেছে।

হাঙ্গামা শুনে বন্ধু ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এলেন, মুচকি হেসে বললেন, দাদার এক কাণ্ড ! মানুষে খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো ! বেশ। বন্ধু জানেন এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর নেই। মানুষকে না দিয়ে কুকুরকে দেওয়া ! শুনে চুপ করে রইলাম। সংসারে কার দাবী যে কার কাছে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, সে ওদের আমি বোঝাবো কি দিয়ে ?

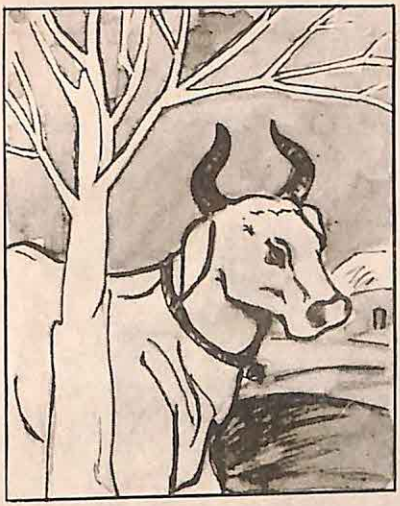
সে যাই হোক, আমর অতিথিকে ডেকে আনা হ'লো, আবার সে বারান্দার নীচে উঠনের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিলে। মালী-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হ'ল যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়লো। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হ'লো,—দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়ালো, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চললো। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি ক'রে খবরদারি করতে লাগলো, কোথাও যেন কিছু ক্ষোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশী।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নাবতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস ? সে ল্যাজ নেড়ে জবাব দিলে,—কি জানি মানে তার কি।

টিকিট কেনা হ'লো, মালপত্র তোলা হ'লো, বন্ধু এসে খবর দিলেন—ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে ; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,—ঢোকবার জো নেই ! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা,—তার পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই, তবু দেওঘর বাসের ক'টা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।



মহেশ

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্ত জোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উঠিয়া যাইতেছে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস ?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে ? বাবার যে জ্বর।

জ্বর ! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড ! ম্লেচ্ছ !

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি ? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ। বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখচি তেমনি ঠায় বাঁধা।

কি কোরব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।



তবে ছেড়ে দে না, আপনি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে ; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর ?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি ? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক। বলিলেন, তাও নেই বুঝি ? কি করলি খড় ? ভাগে এবার যে পেলি সমস্ত বেঁচে পেটায় নমঃ ? গরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই ? ব্যাটা কসাই !

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যে বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদেকেটে হাতেপায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু, না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস-দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না ; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই—খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে ? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি ? ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত ? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোণা যাচ্চে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গরুটাকে দু'দিন পেটপুরে খেতে দিই,—বলিতে বলিতেই সে ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধবে কি করে শুনি ?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধবো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ, কোন্ দিন দেখচি কাকে খুন করবে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ওদের অনেক আছে তবু দেয় না। না দিক গে,—তাহার গলা বুজিয়া আসিল। ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু, তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি !

জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল্ ? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি ? লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেলতে,—

আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে-ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙ্গা ঘরের পিছন হইতে কতটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা ?

কেন মা ?

ভাত খাবে এসো—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা ?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করচ ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে, এবং এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে ? অথচ, এ উপায়েই বা কটা দিন চলে !

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা,—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল ?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিধে পেয়েচে ?

তখন ? তখন হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তা হলে তুলে রেখে দি, সাঁঝের বেলা খেয়ো ?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে ?

গফুর কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা ? আমিনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

দুই

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিতমুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন,তাই, আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মানিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি !

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বললে, তোর বাপকে বল গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে ?

মেয়ে কহিল, তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা। বেলা পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না ?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে তিনদিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে ?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

রাত্রে অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে,—এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়েকের মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব, আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। একজন বুড়া-গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল, আর ভাঙব না, এই পুরোপুরিই দিলাম,—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিও না বলচি—খবরদার বলচি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকাইয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন ?

গফুর তেমনি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি ! আমার জিনিস আমি বেচব না—আমার খুশি। এই বলিয়া সে নোটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আসতে আসতে বায়না নিয়ে এলে যে ?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে ! এই বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটো টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু'টাকা বেশী নেবে, এই ত ? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না ?

না।

কিন্তু এর বেশী কেউ একটা আধলা দেবে না তা জানো ?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি ? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি ?

তোবা ! তোবা ? গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিবুবাবু চোখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস, জানিস ?

গফুর হাতজোর করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতে, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্‌-মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কোরব না কর্তা ! এই বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখত দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ-সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

তিন

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। এমনি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জনমজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল কিন্তু

এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল হয়েছে ভাত? কি বললি—হয়নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

রাত্তিরে বললে কারু মনে থাকে? চাল থাকবে কি করে? রোগা বাপ খাক আর না খাক, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার ভাত গিলবি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে, একঘটি জল দে,—তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোকে মরে তুই মরিস নে!

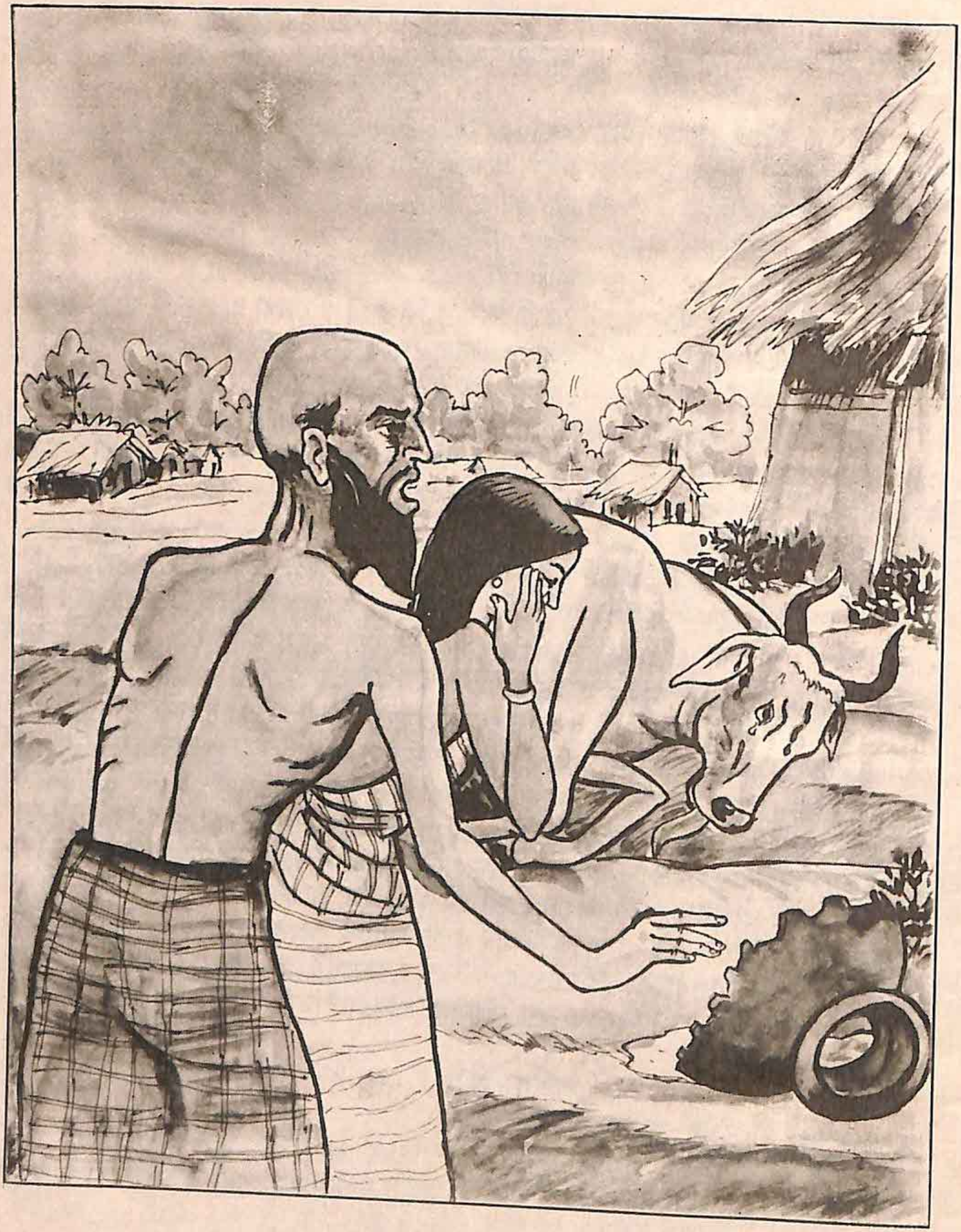
মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল এই তাহার স্নেহশীলা কর্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। হয়ত আজ জল ছিল না—কিংবা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর



হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারানীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এতবড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছিল। পূর্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয়, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ-মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

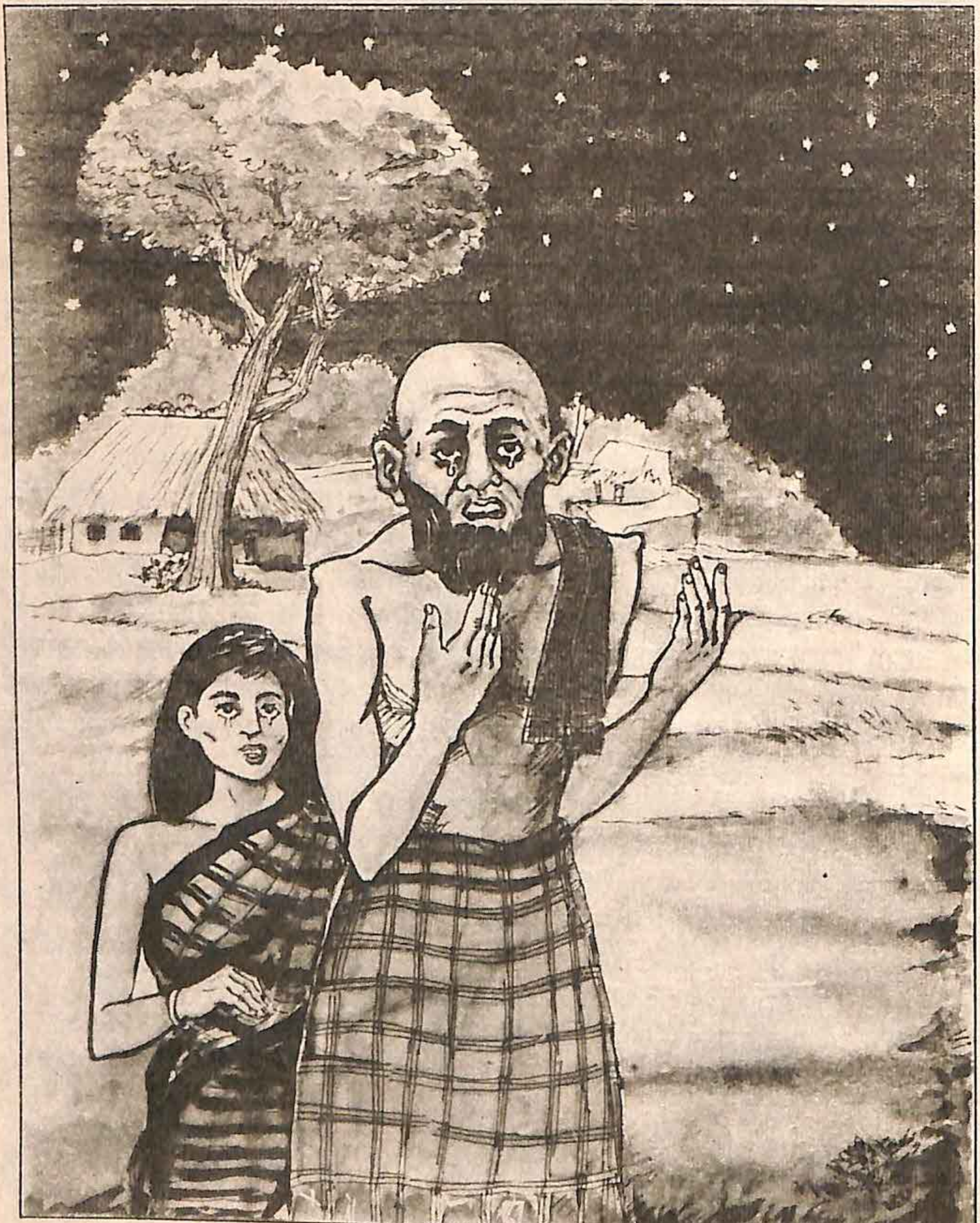
একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে মহেশ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর একজোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চকচকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রায়চিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে-বেচতে হয়।



গফুর এ-সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায় বাবা ?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

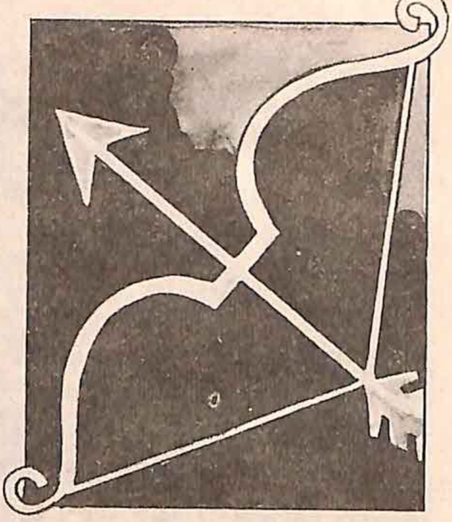
মেয়ে আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস নে মা, চল, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল। গফুর নিষেধ করিল, ও-সব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।



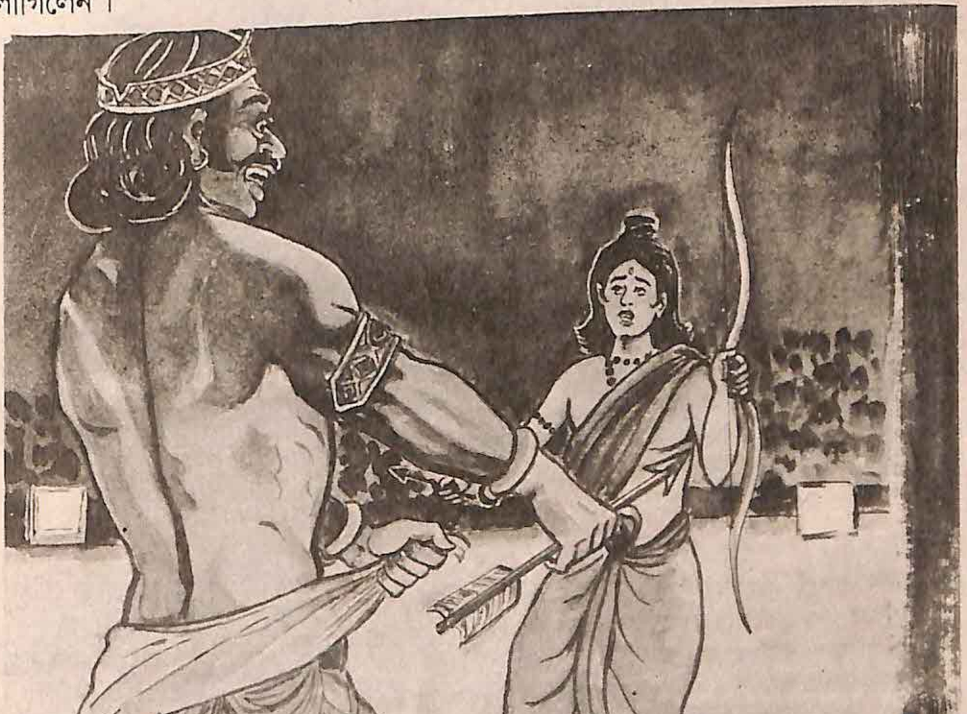


বিচিত্র থিয়েটার

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। 'মেঘনাদবধ' হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন।সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীণরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীণরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে চিনিতে পারিলেন না। একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেল, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড। তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ-সিন উঠিয়াছে। বোধকরি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লম্ফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট-লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ-বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ-বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ। কাহারও কোনো কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুখ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।



ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রে অনুকূল নয়,—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

অনুশীলনী

লালু

১। "তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে।" কে কার ওপর রাগ করে এই কথা বলেছিলেন ? তাঁর রাগ করার কারণ কি ? তিনি মাস্টার ঠিক করে দিতে বলেছিলেন কেন ? শেষপর্যন্ত কি হয়েছিল ?
২। "লালুর মার আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত—" লালুর মার আনন্দ কেন ধরে না ? তাঁর উদ্যোগ আয়োজনের বর্ণনা দাও।
৩। "কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।" কার ঘুম ভেঙ্গে গেল ? ঘুম ভাঙ্গার কারণ কি ?
৪। "ইঃ—ছাতটা দেখছি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে।" বক্তা কে ? কেন তিনি এই কথা বলেছিলেন ?
৫। "কামড়া ব্যাটারা যত পারিস, কামড়া"—এই উক্তি কার ? কোন অবস্থায় তিনি এই উক্তি করেছিলেন ? এরপর তিনি কি করেছিলেন ?
৬। "নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।" এখানে কোন বৃদ্ধের কথা বলা হয়েছে ? তাঁর নির্বুদ্ধিতার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

ছেলেধরা

১। কোন্ প্রসঙ্গে ছেলেধরার গল্প দেশময় ছড়িয়ে গিয়েছিল ?
২। "আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব"—কে কাদের এই কথা বলেছিল ? কিসের হেস্তনেস্ত করার কথা বলা হয়েছে ?
৩। "কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বক্‌শিশ পাবে।" কে কাকে বলেছিল ? কোন কাজের কথা বলা হয়েছে ? সেই কাজ উদ্ধার করার কি পরিকল্পনা করা হয়েছিল ?
৪। "ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।" কে কেন এই কথা বলে চীৎকার করে উঠলেন ? তার এই চীৎকারের ফলে কী ঘটল ?
৫। "সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙে লাফিয়ে পড়ল একটি ডোবায়।" কে ডোবায় লাফিয়ে পড়েছিল ? কেন তাকে প্রাণের দায়ে ডোবায় লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল ?
৬। লেখক কি ভাবে লতিফকে রক্ষা করেছিলেন ?

লালুর পাঁঠাবলী

১। লালু কেন সকলের প্রিয় ছিল ?
২। "তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী'—কার কথা বলা হচ্ছে ? তখন বলতে কখন ? ঐ মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি কী ছিল ? তাই দিয়ে সে কী কী সারাত ?
৩। "দেবীর পূজো পণ্ড হয়ে যায় যে !" কোন দেবীর পূজা কি জন্য পণ্ড হয়ে যাচ্ছিল ?
৪। —কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো—কার কোন নালিশের কথা বলা হয়েছে ? সে কিভাবে নালিশ জানালো বলে মনে করা হয়েছে ?
৫। "আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব"—কার উক্তি ? বলি কী ? কেন সে নরবলি দেবার কথা বলেছিল ? তার এই কথার ফলে কী হয়েছিল ?
৬। "জগজ্জননী সে জ্ঞান আছে তোমার ?" কার উক্তি ? কাকে এই কথা বলা হয়েছিল ? জগজ্জননী শব্দের অর্থ কী ? এর পরে শ্রোতা কী করেছিলেন ?

একটা দিনের কাহিনী

১। ঠ্যাঙাড়ে কি ? কোন সময়ে এবং কোথায় এদের উপদ্রব বেশী ছিল ?
২। নয়নচাঁদ কে ? সে কেন লেখকের ঠাকুরমার কাছে এসেছিল ?
৩। "নিরুপায় হয়ে আমি তখন অন্য ফন্দি আঁটলাম ।" আমি কে ? তার আগের ফন্দি কি ছিল ? কেন সে অন্য ফন্দি আঁটল ? তার নতুন ফন্দি অনুযায়ী সে কী করল ?
৪। "যাঃ শেষ হয়ে গেল"—উক্তিটি কার ? কেন সে এই উক্তিটি করল ?
৫। 'তার বৈষ্ণব হবার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে'—তার বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? তার বৈষ্ণব হবার ইতিহাসটা কী ?
৬। নয়নচাঁদ কী ভাবে ঠ্যাঙাড়েদের শাস্তি দিয়েছিল ?
৭। "আমি পারবো না, নয়নদা"—বক্তা কী পারল না ? সে তার পরিবর্তে কী করতে চেয়েছিল ?

দুঃসাহসী লালু

১। "কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না ।" কার সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে ? 'সে দুর্দিন' বলতে কোন্ দুর্দিনের কথা বলা হয়েছে ? যাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে তাঁর কিসে আপত্তি ছিল না ।
২। "আপনি আমাদের গুরু সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা ।"—বক্তা কে ? 'গুরু' বলতে কার কথা বলা হয়েছে ? কোন প্রসঙ্গে বক্তা এই ধরনের উক্তি করেছে ?
৩। "ও ব্যাটারা ঐ রকম, শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না"—বক্তা কে ? কাদের সম্বন্ধে কখন তিনি এই কথা বলেছিলেন ?
৪। "বাবা গো—গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললে গো !" কে এই কথাগুলি বলেছিলেন ? তিনি কী অবস্থায় এই কথাগুলি বলেছিলেন ?
৫। "এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি"—বক্তা কে ? "শয়তান ছেলে" কাকে বলা হয়েছে ? সে কী ধরনের শয়তানি করেছিল ?

অনুশীলনী

দেওঘরের স্মৃতি

১। বায়ু-পরিবর্তন বলতে কী বোঝ ? মানুষ কখন বায়ু পরিবর্তন করে ?
২। বায়ু-পরিবর্তনের জন্য লেখক কোথায় গিয়েছিলেন ? সেখানে তিনি কোথায় থাকতেন ? তাঁর বাসস্থানের পরিবেশ সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩। এমনি করে সকাল কাটে—কী করে লেখকের সকালবেলা কাটত ? বিকালে তিনি কী করতেন ?
৪। "আজ তুই আমার অতিথি"—বক্তা কে ? কার উদ্দেশ্যে তিনি এই কথা বলেছিলেন ? অতিথির সঙ্গে তাঁর কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল ?
৫। হঠাৎ মনে হ'ল ওর চোখদুটো যেন ভিজেভিজে—কার চোখদুটোর কথা বলা হচ্ছে ? কেন তার চোখদুটো ভিজে ছিল ?
৬। দেওঘরের স্মৃতি কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে ? এই স্মৃতি লেখার কারণ কি ?

মহেশ

১। গফুর জোলার গ্রামের নাম কি ছিল ? তার বাড়ির অবস্থা কি রকম ছিল ?
২। তর্করত্ন কেন গফুরের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ?
৩। "গোহত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে।"—বক্তা কে ? কেন তিনি এই কথা বলেছিলেন ? কর্তা বলতে কাকে বোঝান হচ্ছে ?
৪। তোকে দিলে না এক মুঠো ? ওদের অনেক আছে তবু দেয় না।" বক্তা কে ? 'ওদের' বলতে কাদের বোঝান হয়েছে ? কোন প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা হয়েছে ?
৫। মহেশ কে ? তার সঙ্গে গফুর জোলার সম্পর্ক কি রকম ছিল ?
৬। মহেশকে কারা কেন খোঁয়াড়ে দিয়েছিল ? গফুর তাকে কিভাবে ছাড়িয়ে এনেছিল ?
৭। "আমার জিনিস আমি বেচব না—"বক্তা কে ? কোন জিনিস কেনা বেচার কথা বলছিল ? কেন বক্তা বেচতে রাজী নয় ?
৮। গফুর কেন আমিনাকে মেরেছিল ? আমিনার কি সত্যই দোষ ছিল ?
৯। জমিদার কোন অপরাধে গফুরকে প্রহার করেছিলেন ?
১০। গফুর কেন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল ?

বিচিত্র থিয়েটার

১। কাদের বাড়িতে কি উপলক্ষে থিয়েটার হচ্ছিল ? সেখানে কোন পালার অভিনয় হচ্ছিল ?
২। "জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না।" বক্তা কে ? বক্তা তেমনটি আর দেখেননি কেন ?
৩। "অকৃতজ্ঞ রাম ! দড়ি ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে !" বক্তা কে ? দড়ি ধরার ব্যাপারটি কি ? রামকে অকৃতজ্ঞ বলার কারণ কি ?